কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট ৫১

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে আগামী দিনের শিক্ষা খাত

নতুন চিন্তা, নতুন কাঠামো, নতুন পদক্ষেপ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬ সালের জুন মাসে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে। প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। দেড় শতাধিক বেসরকারি সংস্থা বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম তার সহযোগীদের সমর্থন নিয়ে এসডিজির 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' প্রত্যয়ের আলোকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয় দৃশ্যমান করতে এবং সেগুলোকে নীতি প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সংলাপ সম্পর্কে

বাংলাদেশের শিক্ষাখাত বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। গত দুই দশকে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, লিঙ্গসমতা অর্জন এবং অবকাঠামো সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও, শিক্ষার গুণগত মান, শিখন ঘাটতি, ঝরে পড়া, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জগুলো ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের পরিবর্তন শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে।

এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে "নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে আগামী দিনের শিক্ষা খাত: নতুন চিন্তা, নতুন কাঠামো ও নতুন পদক্ষেপ" শিরোনামে একটি নাগরিক সংলাপ আয়োজন করে। সংলাপে সরকারি নীতিনির্ধারক, মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, শিক্ষক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন অংশীজন অংশ নেন।

আলোচনায় শিখন ঘাটতি ও ঝরে পড়ার সমস্যা, শিক্ষা বাজেটের অপ্রতুলতা, পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, পাঠদানে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। এই ব্রিফিং নোটে সংলাপে উত্থাপিত বিভিন্ন মতামত, উদ্বেগ, প্রত্যাশা ও প্রস্তাবসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

১. পটভূমি

দেশের শিক্ষাখাতের অর্জন গত দেড় দশকে অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এ খাত বরং উল্টো পথেই হেঁটেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে এটাও স্বীকার করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার বেড়েছে, এবং লিঙ্গসমতা অনেকটাই নিশ্চিত করা গেছে। মাধ্যমিকেও ভর্তির হার বেড়েছে, এবং প্রাথমিকেও টিকে থাকার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি কর্মসূচি এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মতো সরকারি উদ্যোগ, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তবে শিক্ষাখাতে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে- শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গেলেও তারা কতটা শিখছে? বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, অনেক শিক্ষার্থীই তাদের শ্রেণি অনুযায়ী প্রত্যাশিত শিখন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে থাকা অনেক শিক্ষার্থী এখনও সাবলীলভাবে তাদের পাঠ্যবই পড়তে পারে না, বা মৌলিক গণিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তারা বেশ দুর্বলতা প্রকাশ করে। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের যেহেতু শিখন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, সেহেতু মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাদেরকে যতই শেখানোর ও পাঠদানের চেষ্টা করা হোক না কেন, শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের বড় ধরণের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে শিখন ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা কেবল শিক্ষার গুণগত মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে না, বরং দেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তির দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপরও সরাসরি প্রভাব বিস্তার করছে।

ঝরে পড়ার বিষয়টিও শিক্ষাখাতের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। যদিও প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার কমেছে, মাধ্যমিক স্তরে এটি এখনও উদ্বেগজনকভাবে বেশি। গত দেড় দশকে ছেলেদের স্কুলে টিকে থাকার সূচকে অবনমন হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি), মাধ্যমিকে স্কুল শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ৫০ শতাংশ নির্ধারিত ছিল, সেটিও অর্জন করা যায়নি। প্রাথমিক শেষ করে মাধ্যমিকে প্রবেশের সময়েই অনেকেই ঝরে পরছে। বিশেষ করে দরিদ্র, গ্রামীণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝরে পড়ার এ প্রবণতা আশংকাজনক হারে বেশি।

দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ এবং পারিবারিক আর্থিক সংকট অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ২০০৯ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে শিশুশ্রম বেড়ে গেছে। কমবয়সী মেয়েদের মাঝে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী নারীদের বিয়ে করার হার ২০১৩ সালে ছিল ৩৪ শতাংশ, ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ শতাংশে। সরকার যে শিক্ষা উপবৃত্তি দিচ্ছে সেটার অর্থমূল্যও বাড়েনি। ফলে একটি বড় অংশের শিশু ও কিশোর তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনের আগেই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে মানবসম্পদ উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

শিক্ষার গুণগত মানের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও থেকে যাচ্ছে। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সীমিত হওয়ায় আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কারিকুলাম অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে থাকায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা যথাযথভাবে বিকশিত হচ্ছে না। এছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহার সাম্প্রতিক কালে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা এখনও শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করা সম্ভব হয় নি।

বর্তমানে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং অভিযোজন ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই বাস্তবতায় শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, ক্রমশ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশের ফলে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

যে জনমিতিক লভ্যতা একসময় দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল, তা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি হবে যে শ্রমশক্তি, তারা আজ শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করছে, কিন্তু সেই শ্রেণিকক্ষ আসলে তাদেরকে কি ফেরত দিচ্ছে, সেটিই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্ন হিসাবে উঠে এসেছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের ভবিষ্যৎ সাফল্য মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ওপর—এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে দীর্ঘদিনের যেসব সীমাবদ্ধতা পুঞ্জিভূত হয়েছে তার ফলাফল এখন ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে। দেশের শিক্ষাখাত এখনো কিছু পুরোনো ধারণার ওপর নির্ভর করে টিকে আছে, যা ২০০০-এর দশকে প্রাসঙ্গিক ছিল, কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তা আর কার্যকর নয়। ২০০০-এর দশকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস এবং প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ, এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দৃশ্যমান অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এখন শুধু এগুলির ওপর নির্ভর করে সামনে এগিয়ে গেলে চলবে না।

চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যারা নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের বিদ্যালয়সমূহে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু অঙ্গীকার করেছে। শিক্ষা বাজেটকে জিডিপির ৫ শতাংশে ক্রমান্বয়ে উন্নীত করা, মিড ডে মিল কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ করা, শিক্ষকদের ট্যাবলেট বিতরণ কর্মসূচি, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ফ্রি ওয়াই-ফাই প্রদান, সারাদেশে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ আরো বেশ কিছু অঙ্গীকার করা হয়েছে। এসব অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। কিন্তু শুধুমাত্র সদিচ্ছা দিয়ে এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না।

ভবিষ্যৎ শোভন কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা সবকিছুই শিক্ষাব্যবস্থার মান ও গুণগত উৎকর্ষের ওপর নির্ভরশীল। নতুন সরকারের অঙ্গীকার ইতিবাচক সংকেত দেয়, তবে প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ণ, পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও সাশ্রয়ী, লক্ষ্যনির্দিষ্ট ও কার্যকর বাস্তবায়ন। শিক্ষাখাতকে প্রকৃত অর্থে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা এখন সময়ের দাবি।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে গত ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে আয়োজিত শিক্ষাখাত নিয়ে 'নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে আগামী দিনের শিক্ষা খাত : নতুন চিন্তা, নতুন কাঠামো ও নতুন পদক্ষেপ' শীর্ষক নাগরিক সংলাপে, ওপরের বিষয়গুলি বিভিন্নভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। এ সংলাপে দেশের শিক্ষাখাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং নতুন সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও নাগরিক প্রত্যাশা যেমন উঠে এসেছে, তেমনিভাবে আলোচিত হয়েছে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়গুলিও। এ সংলাপে সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, রাজনৈতিক দলের নেতা, আমলা, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য, নাগরিক অধিকার কর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

২. দেশের শিক্ষাখাতের সামগ্রিক চিত্র (প্রচলিত বয়ান বনাম প্রতিবয়ান)

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি প্রায় সর্বজনীনভাবে অর্জিত হলেও, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাগ্রহণ এখনো সর্বজনীন হয়নি; বরং এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে উত্তরণের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ হার ২০১৯ সালে সাড়ে ৯৭ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে প্রায় ৭৫ শতাংশে নেমে আসে। একই সময়ে ছেলেদের ভর্তি মেয়েদের তুলনায় দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে প্রাথমিক স্তরে ছেলেদের নেট ভর্তির হার এক বছরে ৭ শতাংশ কমেছে। ২০১৯ সালে শিশুশ্রম ৬ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ২০২৫ সালে প্রায় ৯ দশমিক ২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। এটি থেকে বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক চাপ ক্রমবর্ধমানভাবে ছেলেদের বিদ্যালয় থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এসব প্রবণতা ইঙ্গিত করে যে, প্রাথমিক স্তরে অর্জিত সর্বজনীন প্রবেশাধিকার সাফল্য শিক্ষায় ধারাবাহিক অংশগ্রহণে রূপান্তরিত হচ্ছে না।

কোভিড-১৯-এর আগেই শিক্ষার ফলাফলে যে অবনতি দেখা যাচ্ছিল তা এখনও তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সরকারি বর্ণনায় বলা হয়, কোভিড মহামারির সময় শিক্ষার মান স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের তথ্য দেখায়, শিখন সাফল্য মহামারির অনেক আগেই নিম্নগামী ছিল। গত এক দশকে শিক্ষাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ সত্ত্বেও বাংলা ও গণিতে গড় নম্বর এখনও ২০১৩ সালের নিচেই রয়ে গেছে। পঞ্চম শ্রেণির মাত্র প্রায় ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করে, যা থেকে স্পষ্ট যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী মৌলিক সংখ্যাগত দক্ষতা ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করছে। শিক্ষাব্যবস্থা এমন শিক্ষার্থী প্রস্তুত করছে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা সম্পন্ন করলেও মৌলিক দক্ষতায় ঘাটতি নিয়ে স্কুল থেকে বের হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংকট শ্রমবাজারেও দৃশ্যমান, যেখানে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার (প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ) প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিস্তৃত শিক্ষা তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যার মধ্যে বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি এবং জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের লক্ষ্য শ্রেণিকক্ষের শিখন চর্চা উন্নত করা। ২০১৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদনগুলোতে প্রতিফলিত হলেও এসব মূল্যায়নের পর্যবেক্ষণ শিক্ষাদান, সম্পদ বণ্টন এবং নীতিনির্ধারণের সাথে যুক্ত করার কোনো কার্যকর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়নি। প্রশাসনিক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা বাস্তবায়নকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। সাম্প্রতিককালে পরিচালিত মূল্যায়নে দেখা যায়, জেলা পর্যায়ে এক-চতুর্থাংশেরও বেশি পদ, এবং রিসোর্স সেন্টারগুলোতে প্রশিক্ষকদের অর্ধেকেরও বেশি পদ শূন্য। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও আইসিটি-সংক্রান্ত ব্যয় প্রায়ই অব্যবহৃত থেকে যায়, অথচ অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট ব্যয় নিয়মিতভাবে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়।

সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি মওকুফের মতো বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে থাকে। কিন্তু মোট শিক্ষাব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি বহন করে পরিবারগুলো। পরীক্ষা-নির্ভর ব্যবস্থার কারণে প্রাইভেট টিউশন ও গাইড বই বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও প্রচারিত। গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ ২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী গাইড বই ব্যবহার করে এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউশন গ্রহণ করে। ফলে আনুষ্ঠানিক টিউশন ফি বাতিল করা হলেও তা শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত মোট ব্যয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশই কমাতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রবেশের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে হলেও তা ধরে রাখা ব্যয়বহুল; ফলশ্রুতিতে শিক্ষায় বৈষম্য বাড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে বেসরকারি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।

এটা ঠিক বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যুৎ ও পানির প্রায় সর্বজনীন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ডিজিটাল অবকাঠামোও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। তবে এসব সম্পদের ব্যবহার সীমিত থেকে গেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষে

আইসিটির বাস্তব ব্যবহার প্রাথমিক স্তরে মাত্র প্রায় দেড় শতাংশ, আর মাধ্যমিকে প্রায় ১১ শতাংশ। এর প্রধান কারণ হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির দুর্বল সংযোজন। 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২৪' প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ২০১২ সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রবেশগম্যতা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল স্যানিটেশন সুবিধায় বৈষম্য রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, অবকাঠামো সম্প্রসারণ হলেও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় নি।

বর্তমানে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ১ দশমিক ৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়ে থাকে, যা আন্তর্জাতিকভাবে সুপারিশকৃত ৪ থেকে ৬ শতাংশের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় উভয়ই জিডিপির অনুপাতে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ৭ শতাংশেরও নিচে হওয়ায় শিক্ষা খাতে ব্যয়ের আর্থিক সক্ষমতা যথেষ্ট সীমিত, যা এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান বাধা।

৩. আলোচনায় যেসব বিষয় উঠে এসেছে

সরকারের ইশতেহার ও কর্মপরিকল্পনা

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিএনপির ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু অঙ্গীকার রয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকালে এই ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব হলে তা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়, যা রাজনৈতিকভাবেও সরকারকে লাভবান করবে। কিন্তু সরকার যদি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করে, তাহলে নাগরিক সমাজকে আরও সোচ্চার হতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার ১৮০ দিনের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করছে, যেখানে প্রারম্ভিক কাজগুলোর প্রতিফলন থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর সাথে বেশ কিছু মধ্য মেয়াদি লক্ষ্য জড়ীত আছে। আগামী দুই বছরে সেগুলো যতটা সম্ভব অর্জন করতে হবে। মধ্য-মেয়াদে সব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখা যাবে বলে জনগণ আশা করে। একটি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণের এটাই প্রত্যাশা। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেগুলো আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে ঠিক করতে হবে। ইতিমধ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রথম ১৮০ দিনের কাজের পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু করার এটিই উপযুক্ত সময়।

সুনাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতে সংস্কার

বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষাকে একটি সনদ-নির্ভর কার্যক্রম হিসাবে দেখা। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা অর্জন করতে হবে। কিন্তু শিক্ষার কিছু বৃহত্তর তাৎপর্য রয়েছে। সেটা ভুলে গেলে শিক্ষার এবং দেশ, উভয়েরই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। শিক্ষা হতে হবে নীতি-নৈতিকতাভিত্তিক। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনাগরিকের যে গুণাবলি ও নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে, তা শৈশব থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মূল চালিকা শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। দেশে কর্মসংস্থান একটা বড় সমস্যা যেখানে একটি বিপুল জনগোষ্ঠী বেকারত্বের স্বীকার। এ সমস্যার সামধানের মূল অনুঘটক হল মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সক্ষমতা সৃষ্টি করা, যাতে এর ভিত্তিতে শিক্ষিত শ্রেণি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হতে পারে এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই অর্জন করতে পারে। সারকথা হলো, শিক্ষার উদ্দেশ্য একজন সুনাগরিকের গুণাবলি গড়ে তোলা এবং তাকে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। এই দুটোর সংমিশ্রণ নিশ্চিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার আনার কোন বিকল্প নেই।

কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তাত্ত্বিক শিক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণি থেকে ব্যবহারিকসহ কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক তিন বিভাগেই অন্তত পক্ষে একটি করে বিষয়ে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

তৃতীয় একটি ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা সরকারের একটি বড় প্রতিশ্রুতি। যেসব ভাষা দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে সরকারের আলোচনা হচ্ছে। জাপান, কোরিয়া, চীন, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি এই দেশগুলোর বিষয়ে সরকার আগ্রহী। তবে তৃতীয় ভাষা চালু করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। তাই একটি জেলায় নির্দিষ্ট একটি ভাষা শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শিক্ষা কারিকুলামকে দলীয়করণ

বিগত সময়ে শিক্ষা কারিকুলামকে দলীয়করণ করা হয়েছিল। আগামী তিন মাসের মধ্যে কারিকুলামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে আগামী বছর জানুয়ারির আগেই এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করা যায়। নাগরিক সমাজের দায়িত্ব হবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে কারিকুলাম দলীয়করণ করা না হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক বিবেচনায় নিয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। সরকারের একটা বড় অঙ্গীকার হচ্ছে মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সেক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরণের বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। বাংলা মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা- সবই বিদ্যমান আছে। ক্রমান্বয়ে বাংলা মিডিয়ামে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে এবং অন্যান্য দুটি মাধ্যমে বাড়ছে। এগুলি গভীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যর দাবী রাখে।

সরকারের অগ্রাধিকারে বিবেচ্য

সরকার শিক্ষাখাতের বাজেট বর্তমানে প্রায় দেড় শতাংশ থেকে পর্যায়ক্রমে ৫ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। এটা জানা কথা, বাজেট বৃদ্ধি একদিনে সম্ভব হবে না, ধারাবাহিকভাবে বাড়বে। কিন্তু টাকাটা যাতে অবকাঠামো খাতে বেশী ব্যয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বড় বড় দালানকোঠা করার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের মেধা কীভাবে বিকশিত করা যায় এবং শিক্ষকদের কিভাবে আরও বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। একইসাথে, শিক্ষকদের দক্ষতা ও শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায় তার পেছনে বিনিয়োগ করতে হবে।

বাজেটে সরকারের তিনটি অগ্রাধিকার থাকবে বলে ধারণা করা যায়—স্যানিটেশন ও হাইজিনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মিড-ডে মিলের আওতা সম্প্রসারণ, এবং স্কুল ইউনিফর্মের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ; এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, যাতে ধীরে ধীরে সকল বিদ্যালয়ে সমভাবে ইউনিফর্ম ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা পূর্ণকালীন সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন না। এর একটি কারণ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শক্তিশালী করতে পারলে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈষম্য কমিয়ে আনা

শিক্ষাখাতের বড় সমস্যা বৈষম্য। বাংলাদেশের সেরা শিক্ষক, সেরা স্কুল সবই ঢাকায় কিংবা ঢাকার পরে চট্টগ্রামে। ঢাকা থেকে যত দূরে যাওয়া হবে স্কুলের মান তত খারাপ হতে থাকবে। শিক্ষকেরা স্কুলে কম সময় থাকেন এবং ভালো স্কুলের সংখ্যা খুব কম। শিক্ষার মান দুর্বল। একটা সময় ছিল যখন জেলা স্কুলগুলো খুব ভালো মানের শিক্ষা প্রদান করত। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান হারিয়ে ফেলছে। সরকারের একটা মূল উদ্দেশ্য হবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

সরকার এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে চিন্তা করছে। ওয়ান টিচার ওয়ান ট্যাব- ধারাবাহিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে সব স্কুল টিচার যারা রয়েছেন তাদের ট্যাবলেট কম্পিউটার দেওয়া হবে। সেখানে আপডেটেড কারিকুলাম থাকবে। সরকার প্রযুক্তি ব্যবহার করে শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমাতে সেরা কারিকুলাম, সেরা শিক্ষক, সেরা শিক্ষাসামগ্রী ছড়িয়ে দিতে চায়। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে প্রতিটা স্কুলে কিছু মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রাখা হবে, যেখানে গ্রাফিক্স এবং ভিডিও মাল্টিমিডিয়া শিক্ষার্থীরা দেখতে পারে।

বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা বলে যে, একটা বড় সমস্যা হল, যেকোনো পলিসি ট্রায়াল এন্ড এরোরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়ন করে। এই পুরো কাজটা সমন্বিতভাবে করা হয় না।

যেমন কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার সাথে ২৩টি মন্ত্রণালয় যুক্ত থাকা সত্ত্বেও এটার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নেই। কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বিষয়গুলোকে একজায়গায় আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে বলা হচ্ছে।

ওয়ান ট্যাব নিয়ে কথা হচ্ছে। একটা ট্যাব দিলে শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে এমন নয়। কিন্তু প্রযুক্তিভিত্তিক বৃহত্তর একটা ইকোসিস্টেম সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকদের কাছে ট্যাব থাকবে, শিক্ষার্থীদের কাছে ডিভাইস থাকবে, এবং ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া থাকবে। এগুলো দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এমন নয়, কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো কার্যকরভাবে সহায়তা করবে।

মূল বিনিয়োগ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে

আগামীর বাংলাদেশে আমাদের মূল বিনিয়োগ হতে হবে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে, অবকাঠামোতে নয়। একেবারে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হবে কারিকুলামকে যুগোপযোগী করা। হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার পার্কের মতো কিছু বিনিয়োগ আগে করা হয়েছে যেগুলি কোন কাজে লাগেনি। বিসিক ইকোনমিক জোনে প্রচুর খালি প্লট আছে, কিন্তু সেখানে কোনো ব্যবসা চলছে না। সেই জায়গাগুলোতে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করা যেতে পারে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একজায়গায় আনা যেতে পারে। স্থানীয় উদ্যোক্তা বা ফ্রিল্যান্সারদের অগ্রাধিকার দিয়ে, সহায়তা দিয়ে, তাদের জন্যঋণের ব্যবস্থা করে, অব্যবহৃত অবকাঠামোগুলো ব্যবহার করা হবে যুক্তিসঙ্গত।

বাংলাদেশের অন্ততপক্ষে প্রতিটি জেলায় প্রাথমিকভাবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস স্থাপন করা হবে, যেখানে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট, ট্যাক্স ও টিআইএনের প্রতিটি কাজ যেন স্থানীয়ভাবে করা যায়। এটা সরকারের পরিকল্পনা ও সরকাররে দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করবে। সরকারের সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা ও আন্তরিকতা সরকারের অঙ্গীকার। সরকার যৌক্তিক সমালোচনা সবসময় গ্রহণ করবে এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক তৈরি করবে। সংলাপে উপস্থিত সরকারের নীতি নির্ধারকরা এ বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন।

সরকারের পরিকল্পনা আছে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ‘লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস’ নামে একটা ক্লাস চালু করার। সেই লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস এর উদ্দেশ্য হবে পারসোনাল এবং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে একাগ্রতা বৃদ্ধি। এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে হবে যেখানে ক্লাসরুমে টাকা পড়ে থাকবে, কিন্তু সে টাকা কেউ ধরবে না। আগামীর বাংলাদেশে সুনাগরিক গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের যারা গড়ে তুলবেন, সেই শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো ও মানোন্নয়ন কীভাবে করা যায় সেটি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। মূলধারার শিক্ষা, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষায় সমন্বিতভাবে দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। সরকারের এ বিষয়ে একটি ভিশন রয়েছে। এ ভিশনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ ও বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে নীতি-নির্ধারকরা উল্লেখ করেন।

কর্মমুখী শিক্ষার নানা সমস্যা

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে ও বাস্তবায়নে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক সংকট। বর্তমানে যারা শিক্ষক আছেন তারা কর্মমুখী শিক্ষার আদলে শিক্ষিত না। তাই শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত করতে হবে। অবকাঠামোর সমস্যা আছে এবং আধুনিক কারিকুলামের অভাব রয়েছে। সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছে। একটি সুনাগরিক সৃষ্টি, আরেকটি কর্মসংস্থানমুখী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু কৌশলের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সুনাগরিক কিভাবে সৃষ্টি করা হবে, তার জন্য কী কৌশল হবে তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় নি।

কারিগরি শিক্ষায় গত বছর জানুয়ারিতে একবারে ৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এবং ধাপে ধাপে এখন এই শিক্ষক সংখ্যা ৪ হাজারে পৌঁছেছে। এই নতুন আসা শিক্ষকদের আধুনিকায়ন করতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থী বাড়লে কারিগরি ও ভোকেশনালে সংখ্যা বাড়বে না। অথচ, ব্যানবেইজের ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার সময় ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে যাচ্ছে।

শিক্ষাখাত নিয়ে নতুন ভাবনা জরুরি

শিক্ষাখাত নিয়ে নতুন করে ভাবনা জরুরি। শিক্ষার মান খারাপ; দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যতটা পড়তে ও লিখতে পারার কথা তারা সেটা পারছে না। প্রযুক্তি বা ডিজিটাল এডুকেশন কী এর সমাধান? এখানে বেশ কয়েকটা বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

আর্থিকভাবে সংকটে থাকা, যেমন স্কুলের বাইরে ফল বিক্রি করা শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই বয়সী স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাদের গণিতের দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রে বেশি।

বড় দাগে তিনটি বিষয় ঠিকভাবে করা গেলে শিক্ষাঙ্গন সুন্দরভাবে চলতে পারেঃ কারিকুলাম, শ্রেণিকক্ষ ও ধারাবাহিকতা। কারিকুলামে কি কি থাকবে, পাঠ্যবই কেমন হবে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কী পড়াবেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষক পরিতৃপ্ত কি না, এ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ-প্রযুক্তি আর ধারাবাহিকতা থাকলে একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

স্কুলে ভর্তিতে লটারি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৈষম্য দূর করতে। সবার পারিবারিক সক্ষমতা সমান নয়। স্কুল কমিটির চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমানো যাবে না। শিক্ষার সঙ্গে আলোকিত মানুষ গড়ার বিষয়টি একত্র করে মানবিক মানুষ সৃষ্টি করা সরকারের আকাঙ্ক্ষা। সুনাগরিক তৈরি করার জন্য ছোটবেলা থেকে পাঠ্যবইয়ে অনেক গল্প পড়ানো হয়, আমাদেরকে শিখানো হয় অনেক মানবিক গল্প আছে, কিন্তু তারপরও কেন সমাজে বিরাজমান নিশৃসংতা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

শুধুমাত্র নীতিনৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষা দিলেই দক্ষ ও সুনাগরিক তৈরি হবে—এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে অ্যানালিটিকাল ও ক্রিটিক্যাল চিন্তা, সমস্যা সমাধানের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। দেশের শিশুরা এগুলো না শিখলে দক্ষ জনশক্তি ও সুনাগরিক হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষাগত উন্নয়ন, গাণিতিক দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা ও নাগরিক গুণাবলী এই চারটি ভিত্তিতে কাজ করবে সরকার। সরকার দীর্ঘমেয়াদে সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশকে পূর্ণাঙ্গভাবে নিশ্চিত করতে চায়। নীতিনির্ধারকরা জানিয়েছেন, এসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করবে।

কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের সম্পর্কে ঘাটতি

কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি রয়েছে। অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারিকুলাম চলে আসছে, পাঠ্যবই চলে আসছে। শিক্ষার বিষয়টি অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত আকারে থাকার বিষয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে দেখা প্রয়োজন। সরকার যেসব পরিকল্পনার কথা বলছে তাতে কিছু বৈপরিত্য দেখা যায়। 'আনন্দময় শিক্ষা' আনার কথা বলা হচ্ছে, আবার এর সঙ্গে রেজাল্টকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। তখন মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হওয়ার প্রতিযোগিতায়। কিন্তু স্কুল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে—যেমন তিন মাস ধরে শিক্ষার্থীরা স্কুলে না গেলে ও পাঠদান না চললে—সৃষ্ট শিখন ঘাটতি সহজে পূরণ করা সম্ভব হয় না। অথচ শিক্ষার চাহিদা ও প্রয়োজন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন বাস্তবতা। আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এআই নির্ভরশীল প্রজন্ম আমরা চাই না, তবে এআই দিয়ে ক্ষমতায়িত প্রজন্ম চাই। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাপটপগুলো শিক্ষকদের আলমারির ভেতরে থাকে। সত্যিকার অর্থে ডিজিটাল জ্ঞান বাড়াতে হলে শিক্ষার্থীদের সেগুলো ব্যবহার করতে দিতে হবে এবং এগুলির ব্যবহার শেখাতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে জোরপ্রদান

শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের বিষয়টিতে সরকারের প্রথমেই জোর দেওয়া উচিত বলে আলোচকরা মনে করেন। শিক্ষকেরা যথেষ্ট দক্ষ না। বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২৪ এর প্রতিবেদন মতে, দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৬ শতাংশ সেকেন্ডারি আর প্রাথমিকের ২৫ শতাংশ শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। ১৯৯০ সালের সঙ্গে ২০২৪ সালের তুলনা করলে দেখা যাবে, আগে প্রতি ৬৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক ছিলেন। এখন প্রাথমিকে সেটা শিক্ষক প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থী থাকছে। তাহলে শ্রেণিকক্ষে শিখন ভালো হবে না কেন? এসব প্রশ্ন করতে হবে কারণ এসব প্রশ্ন যৌক্তিক।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সময় শিক্ষার্থী ছিল ১ কোটি ২০ লাখ, যার ৮৫ শতাংশই সরকারি স্কুলে পড়ত। এখন শিক্ষার্থী বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৬২ লাখ। কিন্তু মাত্র ৫৬ শতাংশ সরকারি স্কুলে পড়ে। সরকারি স্কুলের অবকাঠামো বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন হয়নি; শিক্ষার্থী সংখ্যার অবনমনও তারই ইঙ্গিত দেয়।

বর্তমানে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট তথ্য চারটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা এসব তথ্যকে সমন্বিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার বিষয়টি যাচাই করতে হবে। শিক্ষা পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে আরও বেশি সমন্বয় দরকার। ভাল পরিসংখ্যান না থাকলে ভাল পরিকল্পনা ও মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলা

শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো নিয়ে কথা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কোনোরকম শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ না পেয়েই কাজে যোগ দেন। ছোট শিশুদের মানসিকতা বুঝে পাঠদান করা সহজ ব্যপার নয়। সে জন্য প্রাথমিকের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আগেই প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বরাদ্দ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাকা পেতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হয়, তখন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা হয়। আগে থেকে পরিকল্পনা করা থাকলে অর্থবছরের সঙ্গে কর্মবছরের সামঞ্জস্য করা সম্ভব। অর্থ মন্ত্রণালয়েলর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আরো কার্যকরসমন্বয় প্রয়োজন।

তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই বাজেট তৈরি

সরকার প্রকল্পে মেয়াদ বাড়াচ্ছে, কিন্তু বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৭ সালে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল জিডিপির ২ দশমিক ৪৯ শতাংশ। ২০২৫-২৬ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিবছরই শিক্ষাখাতকে এগিয়ে না নিয়ে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে বাজেট কমে গিয়েছিল ৪ হাজার কোটি টাকা। পিইডিপি-৪ এর মেয়াদ তিন বছর বেড়েছে। বাজেট কমেছে ৬ হাজার কোটি টাকা। বিদেশীদের দিক থেকে বাজেট বেড়েছে, কিন্তু সরকারের বরাদ্দ কমেছে। পিইডিপি-৫ এর বাজেট এখন ধরা হয়েছে ৫১ হাজার কোটি টাকা।

এসব বাজেট পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে না খেয়ালমাফিক করা হচ্ছে সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেটা বাস্তবায়নের সক্ষমতা রয়েছে কী না তাও খেয়াল রাখতে হবে।

সরকারি স্কুলগুলোতে অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান পড়ে। এই শিশুদের মধ্যেও চর অঞ্চল, হাওর কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার শিশুদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার প্রযোজন আছে। সবার জন্য একই পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবসম্মত হবে না।

পিইডিপি-৪ এর অনেক টাকা বাস্তবায়ন হয়নি। বড় সমস্যা হলো, শিক্ষায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন—তা মূল লক্ষ্য নয়; বরং মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পগুলোর প্রধান মনোযোগ থাকে অর্থ ব্যয়ের দিকে। কত টাকা নিতে পারল, কত টাকা খরচ করতে পারল তাই বিবেচ্য বিষয়; কত ভবন হয়েছে, কত ভবন হয়নি সেটাই বিচার্য বিষয়। কিন্তু এই ভবনে কত শিক্ষার্থী বসলো, বসে কী কী শিখল সেগুলো প্রায়ই অবহেলি থেকে যায়। এই সরকারের কাছে শিক্ষার মূল পরিমাপক হবে শিক্ষার্থীরা কী শিখল সেটা বিবেচনা করা।

শিখন ঘাটতির পাশাপাশি ঝরে পরা

করোনার সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধারাবাহিকভাবে স্কুল বন্ধ থেকেছে। ২০২০ সালের তথ্যানুযায়ী, ৩৬ শতাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে সরাসরি পাঠদান হয়নি।

শিখন ঘাটতির পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পরা একটা বড় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। কোনো আন্দোলনের কারণে দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলে তার নিয়ন্ত্রণ আর সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকে না। তবে শিখন ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। শিক্ষা কার্যক্রমে সৃষ্ট বিভিন্ন ঘাটতি পূরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিতে হবে।

যে ৩৬ শতাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে সরাসরি পাঠদান হয়নি, যারা এই পাঠদান পায়নি, আগামী দিনগুলোতে কীভাবে সেই ঘাটতি পূরণ করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। যারা ইতোমধ্যে এসএসসি-এইচএসসি পাস করে বেরিয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে আপাতত সরাসরি কিছু করা সম্ভব নাও হতে পারে। এটি দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা। তবে বর্তমানে যারা শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে আছে, তাদের জন্য কী করা যায়—সে বিষয়ে সবার গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হলে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় প্রয়োজন। শুধু মিড ডে মিল প্রদান করা হলেই ঝরে পরা কমানো সম্ভব হবে না। ঝরে পরার সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম দুটোই জড়িত। বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ায় অল্প বয়সে মাতৃমৃত্যু ঘটছে। এতে করে মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান খারাপ হচ্ছে। এসব কিছু একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে, সংস্কার করতে হলে, এবং ভাল ফল আনতে হলে এসব বিষয়কে সমন্বিতভাবে দেখতে হবে এবং এক্ষেত্রে উদ্যোগ ও হতে হবে সমন্বিত।

পরিকল্পনায় বেসরকারি স্কুলের অন্তর্ভুক্তি

দেশের ৪৪ শতাংশ শিশু বেসরকারি স্কুলে যাচ্ছে। পিইডিপি-৫ এর জন্য বাজেট করা হয়েছে এবং এর পরিকল্পনা করা হচ্ছে শুধুমাত্র সরকারি স্কুলের জন্য। সরকারি স্কুলের বাইরে যে শিশুরা যাচ্ছে তারাও এ দেশের সন্তান। তারা যদি বাংলাদেশের সম্পদ হয়, তাদের দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে।

বাংলাদেশে ২০০৬ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে যত মূল্যায়ন হয়েছে তার একটিও বাংলাদেশ সরকার এককভাবে করেনি। উন্নয়ন সহযোগী ও সরকার একসঙ্গে কাজ করেছে। সরকারের কাছে অগ্রাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ প্রয়োজন, সাথে অর্থায়নও প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত দক্ষতারও দরকার। শিক্ষাখাতে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রত্যাশার চাপ। এটাকে মাথায় নিয়ে চলতে হবে। আবার এটাকে মানিয়েও চলতে হবে। অনেকে হয়তো আগামীকালই অনেক কিছু প্রত্যাশা করবে, কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের শিক্ষাখাত অত্যন্ত বৃহৎ—যেখানে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। তাই তাৎক্ষণিক সমাধানের পরিবর্তে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে ধাপে ধাপে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষায় পার্থক্য

সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষার মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে। সাড়ে পাঁচ বছর বয়সের একটা শিশু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায় যেখানে খুবই চমৎকারভাবে বিজ্ঞান, ভূগোল, সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলো কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। শিশুরা এই বিষয়গুলো সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শিখছে। দেশের সরকারি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অনুপস্থিত। প্লে বেজড বা খেলতে খেলতে শেখার যে ধারণা সরকারি স্কুলগুলোতে তা একেবারেই নেই। শুরু থেকেই যদি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিশুদের এসব বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত না করা যায় তাহলে সরকারি ও বেসরকারির মধ্যে পার্থক্য থেকেই যাবে।

শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান

গ্রামীন এলাকায় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে অন্য কাজ করে থাকেন। প্রাইমারি স্কুলে যেয়ে ক্লাস নিয়ে তারপরে জমির কাজে চলে যান। অন্য পেশার কাজ ও করেন। কারও হয়তো ওষুধের দোকান আছে অথবা রেশনের দোকান আছে। শিক্ষকদের যেন জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে এসব কাজ করতে না হয় হয় এমন একটা সামাজিক নিশ্চয়তা ও আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কোন পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ১০তম গ্রেড এবং সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেড নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার শুরু থেকেই বলছে, শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান নিয়ে কাজ করবে। ৭৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইলট আকারে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। এ বছর থেকে সেই কার্যক্রমটি বন্ধ আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সবাই এটি চালু রাখতে চান। মিড ডে মিলের কার্যক্রমটি সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করায় ৪৩ জনকে বদলি করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার আসার পর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তারা যুক্ত ছিলেন। সেই ৪৩ জনের মধ্যে ৩৮ জনকে ইতিমধ্যে নিজ নিজ জেলা-উপজেলায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

পিইডিপির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বরাদ্দ ফেরত যায় অথচ শত শত স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ নেই, খেলার মাঠ নাই। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষা ও সংখ্যাজ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল বলে ধারণা করা হয়। এটির অন্যতম কারণ প্রাথমিকের শিক্ষা বহুবিভাজন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেশে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে সুগঠিত কোনো নীতিকাঠামো নেই। তাই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় না।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় উপবৃত্তি ও মিড ডে মিল

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তর। ৪০ বছর ধরে ১৮ হাজার মাদ্রাসার মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৫১৯ টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সাড়ে ৩ হাজার টাকা আর সহকারি শিক্ষক ৩ হাজার ৩০০ টাকা বেতন পান। আর বাকি প্রতিষ্ঠান সমূহে কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই। ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও মিড ডে মিলের আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হবে।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষার অধীনে নিয়ে আসা হবে এবং কারিকুলাম, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ, ভাতা প্রত্যেকটা জিনিস প্রাথমিকের মানে নিয়ে আসা হবে বলে বলা যাচ্ছে। এগুলোর আশু বাস্তবায়ন জরুরী।

কারিকুলাম পর্যালোচনার কাজ শুরু

সরকার কারিকুলাম পর্যালোচনার কাজ শুরু করেছে। অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময় থেকেই পাঠ্যবইগুলো পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে পর্যালোচনার কাজটি শেষ হবেবলে আশা করা যায়। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পরিমার্জিত কারিকুলামটি কার্যকর হবে। কারিকুলাম রাতারাতি বদলনো যায় না। ২০২৮ সালে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য এটা কার্যকর করার কাজ শুরু হবে।

বৈশ্বিক পরিসরে একক বা সিঙ্গেল কারিকুলাম নেই। তার মানে এই না বাংলাদেশে আমরা একক কারিকুলাম চাই না। কারিকুলাম যেন সবার জন্য সঠিক হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট মানের শিক্ষা যেন সবাই অর্জন করে— এটাই লক্ষ্য হতে হবে। সামাজিক শিক্ষা, ইতিহাস, বাংলা, গণিত এবং ইংরেজির মতো বিষয়ে যেন সবার একইরকম ভিত্তি গড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ব্যবস্থা কুক্ষিগত

বাংলাদেশে ৭ লাখ ৩১ হাজারের বেশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের বেশীরভাগই কোন না কোনভাবে ঝরে পড়ছে। তারা তাদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা তারা পাচ্ছে না। ফলে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই অধিকারভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হবে। শ্রেণিকক্ষগুলো প্রতিবন্ধী বান্ধব হতে হবে। যে ভবনগুলো রয়েছে, সেগুলোতে অভিগম্যতা (অ্যাক্সেসিবিলিটি) খুবই সীমিত; শৌচাগারগুলোও প্রতিবন্ধীবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।

স্নায়বিক কারণে পড়তে অসুবিধা হয় এমন অনেক শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে না। এমন পরিক্ষার্থীর পরীক্ষা কীভাবে নেওয়া হবে, কোথায় বসানো হবে, কতক্ষণ বেশি সময় দিতে হবে এগুলো বুঝারও উপায় নেই, বিধিবদ্ধ কোন নিয়মও নেই। অন্তর্ভুক্তিমূলক যে শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, সেটা বাস্তবায়ন কঠিন হলেও কাজটি সমপন্ন করতে হবে।

দেশের আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছেঃ বিশেষ শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা এবং সমন্বিত শিক্ষা। প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী যার যেটা সুবিধা সেটা দেওয়ার কথা তার সাথে বাস্তবের অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্রেইল বইয়ের তীব্র সংকট দেখা যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য হাইস্কুল পর্যন্ত ব্রেইল বই সরবরাহ করা হলেও পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় করা প্রয়োজন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা জরুরি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার বিষয়টি দেখবে? শোনানো হয়, রুলস অব বিজনেস পরিবর্তন করতে হবে। এই সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে যাবেন বলে সবাই প্রত্যাশা করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাদের

একাডেমিক বাধা অনেক বেশি। প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলে চাকরির বাজারে প্রবেশ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এটা ভাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের মতো কিছু বিষয় আছে যেগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে চলে। সেগুলোও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার কাজ শুরু হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব দেশের প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে অন্তত একটা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানকে শতভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মমুখী শিক্ষা

হিজড়া জনগোষ্ঠীর কথা পাঠ্যপুস্তকে নেই। এটি অন্তর্ভুক্ত করা গেলে শিশুদের মধ্যে এ বিষয়ে ভীতি কমবে এবং হিজড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তারা আরও সচেতন হতে পারবে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মমুখী শিক্ষার পরিকল্পনায় জোর দেওয়া প্রয়োজন। এটা বাস্তবায়ন হলে হিজড়া জনগোষ্ঠী অনেক উপকৃত হবে। অন্তবর্তীকালীন সরকারের আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের বা ভিন্ন পরিচয়ের লোকজনকে বিতাড়িত করা হয়েছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীও মব কালচারের শিকার হয়েছে। দিনাজপুরে হিজড়া পল্লী উচ্ছেদ করা হয়েছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে কী না সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলতে হবে।

শিক্ষা যেন দলীয় এজেন্ডা না হয়

শিক্ষা অবশ্যই একটি রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ। কিন্তু সেটা যেন দলীয় এজেন্ডা না হয়, পার্টিজান এজেন্ডা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমানোর কথা বলা হচ্ছে। আমরা তো সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। স্কুলগুলোতে যেন রাজনৈতিক মনোনয়ন দেওয়া না হয়। যোগ্যতা কমানো হলে বিভিন্ন ধরনের মানুষের আসার সুযোগ হবে যা স্কুল পরিচালনাকে ব্যাহত করতে পারে। ২০১৭ সালে হাইকোর্টের রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা রুলিং আছে, যেটায় আপিল বিভাগও সম্মত হয়েছে। এক্ষেত্রে দলীয় কাউকে কোনো স্কুলের ম্যানেজিং বা পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

সংবিধান সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু সংবিধানে শিক্ষাকে নাগরিকের অধিকার হিসেবে এখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাহলে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতে প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন করা যাবে।

ক্রীড়া-সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতে হবে

সরকারের মন্ত্রী-উপদেষ্টারা জানিয়েছেন, তারা কেবল সনদ বা সার্টিফিকেশননির্ভর শিক্ষা চান না; বরং খেলাধুলা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। ধর্ম বিষয়ে পড়াতে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সংস্কৃতির জন্য, ক্রীড়ার জন্য শিক্ষক দেয়া হবে কি না সে বিষয়টি পরিস্কার করা হয়নি। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক শিক্ষাও দিতে হবে। এই সরকার মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা প্রচলন করতে চাইলে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং ধর্ম তিনটি একই সাথে থাকতে হবে। এখন যারা ক্রীড়ায় বাংলাদেশের জন্য নাম করেছে তারা একেবারে গ্রামগঞ্জ থেকে উঠে এসেছে। এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিলে হয়তো আমরা একদিন কোন বিশেষ খেলায় বিশ্বকাপও জিতব!

কারিকুলামের আওতায় মুখস্ত করল, জ্ঞান অর্জন করল, কিন্তু শিশুরা দেহ-মনে বিকশিত হলো না। দেহ-মনে বিকশিত হওয়ার জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রয়োজন। এখনো অনেক স্কুল আছে যেখানে কোন খেলার মাঠ নাই।

খেলাধুলা ও সংস্কৃতিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এক সাথে কাজ করছে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে একজন ক্রীড়া কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। প্রতিটি স্কুলে অন্তত ছয়টি খেলার প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে সে সুযোগ তৈরি করা হবে। নাটক, গান, কবিতা, আবৃত্তি ও নাচের মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে তিন থেকে চারটা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ করা হবে। গণিত, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, রসায়নের অলিম্পিয়াড শুরু করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ ইতিবাচক হলেও, এর পরিসর ও ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

লটারি বাতিলের সঙ্গে তৃণমূলের বাস্তবতা

স্কুলের লটারি বাতিল করার আগে তৃণমূলের বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করে দেখতে হবে। নামিদামি স্কুলগুলোর জন্য লটারি ব্যবস্থা থাকলেও, গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের সুযোগ নেই। দামি ও নামিদামি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে লটারি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তবে একজন রিকশাচালকের সন্তানের পক্ষে সেইসব স্কুলে লটারি ছাড়া ভর্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব। লটারি রেখে বরং সুশাসন যেন বজায় থাকে, ব্যবস্থাপনা যেন ভালো হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

আনুপাতিক হারে লটারি ও মেধাভিত্তিক মিশ্র ব্যবস্থা চালু করা যায় কী না সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে। লটারির মাধ্যমে ৫০ শতাংশ আর বাকি ৫০ শতাংশ মেধাভিত্তিক হতে পারে। স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া বা কোন এলাকার শিক্ষার্থীরা পড়বে সেটাও একটা বিবেচ্য বিষয়। গেন্ডারিয়ার শিক্ষার্থী কেন মোহাম্মদপুর পড়তে আসবে? শিক্ষা নিয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এই খাতের সংশ্লিষ্টরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

স্কুলের ছুটিতে প্রয়োজন সমন্বয়

স্থানীয় প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা ক্যালেন্ডারের কথা বলা হয়েছিল। জুম চাষের এলাকায় কেন শিক্ষার্থীদের রোজার মাসে বন্ধ দিতে হবে? কেন তাদের জুম চাষের সময় বন্ধ দেওয়া হবে না? এসব বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া সম্ভব না। স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসব এলাকায় স্কুল বন্ধ রাখা দরকার। স্কুলের ছুটির ব্যাপারে সমন্বয় দরকার। আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় শুধুমাত্র স্কুল ক্যালেন্ডারের বিষয় না।

আগামী বছরের শিক্ষা ক্যালেন্ডার করার আগে সবার সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে বলে উপস্থিত নীতি নির্ধারকরা অবগত করেন। আলচনায় ছুটির কথাটা বারবার উঠে এসেছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর শিক্ষক বিদেশ থেকে আনতে হয়। হঠাৎ পরিবর্তন করলে তারা পড়াতে পারবে না। সমন্বয় ও আলোচনা করে ক্যালেন্ডার চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়।

একক কারিকুলাম দরকার

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের মূল দায়িত্ব হলো ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন তৈরি করে দেওয়া। মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌঁছে কোনো শিক্ষার্থী যদি মাদ্রাসা ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় সহজে স্থানান্তর হতে পারে, সে জন্য একটি সমন্বিত বা একক কারিকুলামের প্রয়োজন রয়েছে। সিঙ্গেল কারিকুলাম বলতে কারিকুলামে কোনো ভিন্নতা থাকবে না—এমন নয়; বরং এখানে দেশীয়, আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন মানদণ্ডভিত্তিক (যেমন বিদেশি বা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) কাঠামো বজায় রেখেই একটি সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিকুলাম বোঝানো হয়। বাংলাদেশে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারিকুলাম, পাশাপাশি ইবতেদায়ি ও দেওবন্দি মাদ্রাসা, বাংলা মিডিয়াম এবং ইংলিশ ভার্সনসহ বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা সহাবস্থান করতে পারে। একক কারিকুলামের বাইরে এসব ভিন্নধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত বা বিকল্প হিসেবে চালু রাখতে কোনো ধরনের বাধা থাকা উচিত নয়।

সুশাসন ও জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

শুধু বাজেট বাড়ালে হবে না, সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ে উন্নতির ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।

দুর্নীতি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে। দুর্নীতি কমানো সহজ হবে না। তবে এখন প্রতিটি দরপত্র অনলাইনে হচ্ছে। ফলে সবধরনের বদলি অনলাইনে হবে। যে জায়গাগুলোতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি বা বাণিজ্য হয়ে থাকে, সে জায়গাগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এমপিও ব্যবস্থা বন্ধ করা গেলে ভালো হতো বলে অনেকে মনে করেন, তবে এটি এখন এত বড় পরিসরে বিস্তৃত যে তা বন্ধ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

উপস্থিত নীতিনির্ধারকরা জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে স্কুলগুলোর ক্ষমতায়ন করা হবে এবং সরকার চায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কার্যক্রম মূলত স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। রাতারাতি এটা বন্ধ করা সম্ভব না। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ছয় মাসের ভেতর অনেক ধরনের পাইলটিং করা হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো, তিন বছরের মধ্যে কোচিংয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে কমিয়ে আনা।

প্রতি এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে তিন থেকে চারটা কোচিং সেন্টার, তিন থেকে চারটা মাদ্রাসা বিভিন্ন নামে পরিচালিত হয়। সেখানে যারা পাঠদান করেন তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু আছে সেটাও জানা যায় না। শিক্ষার এই ধারাও সামাজিকভাবে একধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করছে। এটিকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা এবং সুশাসনের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ভাবতে হবে।

প্রাথমিকে স্কুল পরিচালনা কমিটির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে মাধ্যমিকেও তা থাকতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা থেকেও এ প্রক্রিয়াকে দূরে রাখা প্রয়োজন। সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর অনেক সময় চকচকে ভবন নির্মাণের দিকে বেশি মনোযোগ দেন—কারণ অবকাঠামো তৈরি হলে তা দৃশ্যমান সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখছে বা শিক্ষার গুণগত মান কতটা নিশ্চিত হচ্ছে, সে বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মিড ডে মিল এখন ১৩৯ টি উপজেলায় প্রচলিত রয়েছে। পরবর্তী পিইডিপি-৫-এর অধীনে সব উপজেলায় এবং পৌরসভায় তা সম্প্রসারিত করা হবে। পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি স্কুলে এটা চালু করা হবে। এরপরের ধাপে বেসরকারি স্কুলেও এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। পাশাপাশি মিড-ডে মিল কার্যক্রমেও যেসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

পথ শিশুদের জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে পথশিশুদের জন্য যেসব প্রকল্প আছে সেগুলো আরও শক্তিশালী করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের শিক্ষা নীতির আলোকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার যেহেতু আইএলও কনভেনশনের ১৩৮ এর অনুসমর্থন করেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে সরকারের একধরনের বাধ্যবাধকতা আছে। বি.এন.পি.-র নির্বাচনী ইশতেহারেও শিশুশ্রম দূর করার বিষয়টি বলা আছে।

শিশুশ্রমের সঙ্গে শিক্ষাখাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বা ১৪ বছর পর্যন্ত করতে হবে। এটাই কাজে প্রবেশের নূন্যতম বয়সসীমা। তা না হলে ১০ থেকে ১৪ বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত একটা বড়সংখ্যক শিশু শ্রমবাজারে ঢুকে যাবে। তা না হলে, এদের অনেকেই বাল্যবিবাহের শিকার হবে।

ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন

ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। একই লেভেলের শিক্ষা প্রদানে কোন কোন শিক্ষা ধারায় ১০ গুণেরও বেশি বেতন নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এটাকে একটা বোর্ডের অধীনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। কিছু কারিকুলাম দীর্ঘদিন ধরে পড়ানো হচ্ছে কিন্তু বৈশ্বিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পরেছে।

শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার দর্শনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নীতিগত দিক থাকে, আরেকটা পদ্ধতিগত দিক থাকে। দর্শন হতে হবে সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে দেখতে হবে। আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলোকে ইহজাগতিক হওয়া প্রয়োজন, পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গণতন্ত্রায়নও জরুরি। ভালো ছাত্ররা শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় না। শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন-ভাতা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত না করলে শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীরা আসতে আগ্রহী হবে না।

সংবিধানের ১৭ (ক) অনুচ্ছেদে অনুযায়ী, দেশে আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সবার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু হবে। একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সংবিধানে এর উল্লেখ থাকলেও ৫৫ বছরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

স্থায়ী কোনো নীতিমালা নেই

শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে স্থায়ী কোনো নীতিমালা অনুপস্থিতি। এ পর্যন্ত সাতটি শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে। যে দলই ক্ষমতায় আসে, তারা নিজেদের মতো একটি নতুন চিন্তাধারা দাঁড় করায়; পরবর্তীতে যারা ক্ষমতায় আসে, তারা আগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও একটা স্থায়ী নীতিমালা দাঁড় করানো যায়নি। দু'বার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান সরকারকে একটা সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করবে বলে জানান জামায়াতে ইসলামি দলের প্রতিনিধি।

সংস্কার না হলে পুরনো বন্দোবস্ত ফিরবে

জুলাই সনদের ভিত্তিতে দেশে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল। তবে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষণ না হওয়ায় শিক্ষাখাতে যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে সেগুল স্থায়ী ভিত্তিতে রূপ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে প্রায়ই নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করে, ফলে অনেক সময় জনগণের প্রকৃত ভাবনা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।

মেধা পাচার বা ব্রেন ড্রেন বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর অনেক মেধাবী ব্যক্তি দেশে ফিরে আসেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে যে দেশে ফিরে তারা কিছু অবদান রাখতে পারবেন। ৬ থেকে ১০ মাস পর তারা দেখলেন যে পরিবর্তন যা হয়েছে সেটা অনেকাংশেই কৃত্রিম। মৌলিক সংস্কারের দিক থেকে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ফলে হতাশ হয়ে তারা আবার দেশ ত্যাগ করেন।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সংস্কারের প্রত্যাশা, সে জায়গা থেকে সরে গেলে আবার সেই পুরনো বন্দোবস্ত ফিরবে। সব খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের স্বীকার হয়েছে শিক্ষাখাত। সেই ধ্বংসের অতল গহ্বরে যাতে সব খাত আবার তলিয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে।

প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলোর নিয়ন্ত্রণ

নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ই-লার্নিং-এর কথা বলা হচ্ছে। সন্তানদের হাতে মোবাইল, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ তুলে দেওয়ার পর তারা অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা, ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে এসব ডিভাইসেই বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ছে। এমনকি কেউ কেউ বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক থেকে দূরে সরে গিয়ে ডিজিটাল জগতে বেশি সময় কাটাচ্ছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে—সে প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত রাখা যাচ্ছে না; আর ক্লাসে উপস্থিত থাকলেও অনেকেই পিছনে বসে মোবাইল ব্যবহার করছে। এর ফলে শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে এবং নৈতিক অবক্ষয়ের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি সাইবার বুলিং এখন একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আঁচল ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২৫ সালে ৪০৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তার মধ্যে অধিকাংশ আত্মহত্যা করেছে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়ে। মোবাইলের মাধ্যমে যে শিশুরা সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে, সেটা প্রতিরোধের উপায় নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ কাজে লাগবে, আবার একই সাথেপ্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সুইডেন-ডেনমার্কের মতো দেশে স্কুলে এখন স্মার্টফোন-ট্যাবলেট বন্ধ করে দিচ্ছে। দেশে এখন আইন করে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা যেমন দশম শ্রেণির পর ক্যালকুলেটর ব্যবহার শুরু করেছি, তেমনি ট্যাব ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এমন নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরাসরি আন্তঃক্রিয়া কমে না যায়।

শিক্ষা ও শিল্পখাতের মধ্যে অসামঞ্জস্য

ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ করে কলকারখানা স্থাপন করলেও সেগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের ঘাটতি দেখা যায়। দেশের বিভিন্ন খাতে শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে মধ্যম ও উচ্চপদগুলোতে যেসব দক্ষতা প্রয়োজন সে অনুযায়ী জনবল পাওয়া যায় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশি নাগরিক এসব পদে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করছেন। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যেন দক্ষ হিসেবে এসব পদে যোগ দিতে পারেন সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে।

কর্মসংস্থানমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দক্ষতানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাশাপাশি আনন্দময় ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। একইসঙ্গে পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধ ও নাগরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের একটি প্রক্রিয়া নয় বরং জাতীয় উৎপাদনশীলতা, শিল্পায়ন, উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মজবুত ভিত্তি। নতুন সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে যে দক্ষতাভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ও অর্থনীতির মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতা দূর হওয়ার একটি বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

শিল্প উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা লব্ধ জ্ঞান ও শিল্পখাতের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ব্যাপক অসামঞ্জস্য। প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবন শেষ করলেও শিল্পখাত প্রায়শই প্রয়োজনীয় দক্ষ মানব সম্পদ খুঁজে পায় না। ফলে উন্নয়ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায় না।

বিশ্বের সফল অর্থনীতিগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, টেকসই উন্নয়ন ও শিল্পায়ন কখনোই শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, গবেষণা সহযোগিতা এবং উদ্যোক্তা মনোভাবএই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা সংস্কারকে কেবল সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি হিসেবে নয়, জাতীয় অর্থনৈতিক রূপান্তরের কৌশলগত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এজেন্ডা

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার, শিশুদের অধিকার এবং একইসঙ্গে একটি নাগরিক অধিকার। শিক্ষার দুটি এজেন্ডা আছে, একটা হলো রাজনৈতিক, আরেকটা অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক এজেন্ডা হলো—দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের (এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন) ফলে বাজার সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় যেতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারবে না।

অর্থনীতির ওপর নানা ধরনের অভিঘাত আসবে, সেগুলো সামাল দিতে হলে একটি শক্তিশালী ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন—এটাই সবচেয়ে জরুরি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে একটা যৌথ মিথস্ক্রিয়া দরকার। দেশকে যদি সামনের দিকে যেতে হয় তবে অর্থনৈতিক এজেন্ডাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটা অনুধাবন করতে পারলে রাজনৈতিক এজেন্ডাও বাস্তবায়িত হবে।

জিডিপির আকার ও শিক্ষায় বরাদ্দ

বিএনপির তাদের ইশতেহারে বলেছে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে জিডিপির ৫ শতাংশে নিয়ে যাবে। জিডিপি যদি ১০০ টাকা হয় তাহলে এটা হবে ৫ টাকা। আর জিডিপি যদি ২০০ টাকা হয় ৫ শতাংশ হবে ১০ টাকা। এক্ষেত্রে জিডিপিটার আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জিডিপির আকার বড় হলে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ব। শুধু জিডিপির পারসেন্টেজ বললে হবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শতাংশ হারে হ্রাস পাবে—তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশে নেওয়া হবে বলে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ৩ শতাংশ বরাদ্দ বাড়বে স্বাস্থ্য আর সামাজিক সুরক্ষায়ও জিডিপি-র শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু মোট পরিমাণ ১০০ শতাংশের বেশি হবে না, সেহেতু অন্য কোনো খাত থেকে জিডিপির শতাংশ কমাতে হবে। সুতরাং অগ্রাধিকারগুলো ঠিক করতে হবে। অবকাঠামো খাতে কমানো হবে কি না, কৃষি খাতে কী হবে—কোন খাতে ব্যয় কমিয়ে কোন খাতে বাড়ানো হবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যের প্রচলন

মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই—এ বিষয়টি এখন সর্বজনস্বীকৃত। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার সঙ্গে আগামী দিনে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে।

বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যমে যেন বৈষম্য আরও বেড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বরং শিক্ষার মাধ্যমে যেন বৈষম্য দূর হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বৈষম্য হ্রাস ও নিরসণের হাতিয়ার।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পুরো প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক যত ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকুক না কেন নাগরিকদের কাছে নীতি নির্ধারকদের জবাবদিহিতার সংস্কৃতি নিশ্চিত করতে হবে। এটি এগিয়ে নিতে হলে স্থানীয় সরকার ও নাগরিকদের মাধ্যমে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যের প্রচলন এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মূল্যায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমে, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মাধ্যমে একটি দক্ষ ও প্রফেশনাল জনশক্তি গড়ে উঠবে। বিনিয়োগ আনতে হলে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে। অষ্টম শ্রেণির পর ভোকেশনাল শিক্ষা আনা হবে এমন আলোচনা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ভোকেশনাল শিক্ষায় যেতে চায় না। প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী প্রজন্ম আগের প্রজন্ম থেকে ভালো থেকেছে। ভবিষ্যতে এটা সম্ভব হবে না যদি শিক্ষাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা না যায়। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে জোর দিতে পারলে সামাজিক অভিগম্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে আয় বৈষম্য, ভোগ বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জ্ঞান-বৈষম্য কি বাড়ছে? এই বিষয়টিতেও নজর দেওয়া দরকার। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যারা যাচ্ছেন তাদের সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে । শুধুমাত্র আলোচনা করলে হবে না, সামাজিক আন্দোলনের দরকার হবে। শিক্ষা কাঠামোকে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত, বৈশ্বিক বাজার ও দক্ষতার সাথে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে।

৪. সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মূল্যায়ন

নতুন সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষাখাতের কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধানের সাথে বিভিন্ন অঙ্গীকার অর্জন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইশতেহারের শিক্ষার অভিগম্যতা, দুর্গম এলাকায় ঝরে পড়া রোধ, সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের অঙ্গীকার রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার মানের অবনমন এবং প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে উত্তরণের দুর্বলতাকে সরাসরি মোকাবিলা করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার ওপর জোর এবং মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার রয়েছে। এতে বুঝা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা যে দক্ষতা বিকাশকে সীমাবদ্ধতা করে দিচ্ছে যে সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহারে বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম প্রদান, মিড ডে মিল কর্মসূচি প্রচলন এবং স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়নের অঙ্গীকার রয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র চালুর প্রস্তাব প্রশাসনিক তথ্য ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করতে সহায়ক হতে পারে। তবে শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক অনুসরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের বিদ্যমান বাস্তবতা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই এবং শিক্ষা বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল—এগুলো শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে। এগুলো অতীতের মতো শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি সরবরাহে সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকি বহন করে। কাঠামোগত বড় পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে যদি শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়। তবে কেবল অর্থায়নই শিক্ষা খাতের গভীরে প্রোথিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে সক্ষম নয়।

৫. অঙ্গীকারসমূহের আর্থিক ও বাস্তবায়নযোগ্যতা মূল্যায়ন

মূল উপস্থাপনে শিক্ষাখাতের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। জিডিপির ৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের অঙ্গীকারটি সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী এবং বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে কঠিন। বর্তমানে প্রকৃত ব্যয় প্রায় ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ, ফলে কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ গুণ ব্যায় বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। ২০৩১ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতি বছর জিডিপির প্রায় ০.৬

শতাংশ পয়েন্ট হারে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন, যা দেশেরইতিহাসে নজিরবিহীন। কর-জিডিপি অনুপাত ৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং উচ্চ রাজস্ব ঘাটতি থাকায় এই লক্ষ্য অর্জন আরও কঠিন হবে। একই সঙ্গে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের হার মাত্র ৪৯%, যা বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে বেশী অংকের অর্থের যথাযথ ব্যবহার অনেকটাই নির্ভর করবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ওপর।

মিড ডে মিল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বছরে প্রায় ৮২ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এই কর্মসূচীরসফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করবে শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো এবং কমিউনিটি তদারকির ওপর। স্যানিটেশন সুবিধা উন্নয়নে আনুমানিক ৪ হাজার ৮৭৫ কোটি টাকা প্রয়োজন, তবে মূল সমস্যা অবকাঠামোর ঘাটতি নয়, বরং লিঙ্গভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অভাব।

বিনামূল্যে ইউনিফর্ম প্রদানে বছরে প্রায় ৩ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে, যা লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই করা সম্ভব। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ট্যাব, এবং ওয়াইফাই এগুলো উচ্চ ব্যয়সাপেক্ষ। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব বিনিয়োগ কার্যকর হয় না এবং প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না।

৬. সুপারিশ

শিক্ষাখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ত্বরান্বিত করতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হচ্ছে:

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

মুখস্থনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি চালু করতে হবে। শেখার ফলাফল নিয়মিত মূল্যায়ন ও তা শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষকদের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি

শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নকে একটি ধারাবাহিক ও কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকতা শুরুর আগে ও পাঠদানকালীন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশাসনিক কাজের চাপ কমিয়ে তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিক্ষাদানে আরও মনোনিবেশ করার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষকতার পেশাকে আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক করে তুলতে প্রণোদনা ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিকুলাম সংস্কার ও দক্ষতা উন্নয়ন

কারিকুলামকে বাস্তবমুখী ও শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা এবং ডিজিটাল দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য কারিকুলামে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার পথ সৃষ্টি করতে হবে।

ঝরে পড়া রোধ ও সমতার নিশ্চিতকরণ

ঝরে পড়া রোধে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং সঠিক প্রণোদনা দিতে হবে, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষাখাতের পাশাপাশি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি ঝরে পরা শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে কার্যকর তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ

প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী নিশ্চিত করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাকে শুধু নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে বৈষম্য ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জবাবদিহি ও সমন্বয়

শিক্ষাখাতে কার্যকর শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকিতে জবাবদিহি কাঠামো জোরদার করতে হবে। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বাজেট বরাদ্দ ও কার্যকর ব্যবহার

শিক্ষাখাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করতে হবে এবং বাজেটের কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা খাতের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে। গুণগত মান বজায় রাখা এবং অপচয় কমাতে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।

প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার

শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারকে কেবল অবকাঠামো বা ডিভাইস সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা শিখন পদ্ধতির সাথে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাসঙ্গিক ও মানসম্মত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে হবে এবং তা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে।

শিক্ষা ও শ্রমবাজারের সংযোগ

ভবিষ্যৎ কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পখাত এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে হবে, পাশাপাশি উদ্যোক্তা দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ কর্মবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মূল্যায়ন ও প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

শিক্ষাখাতে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নীতিমালা আরও কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করতে হবে।

৭. উপসংহার

বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের অগ্রগতি ও এ খাতের সীমাবদ্ধতা- দুটি বিষয়ই সমান্তরাল বাস্তবতা। প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং লিঙ্গ সমতায় অগ্রগতি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন। শিক্ষাখাত এখন এমন একপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শুধু সংখ্যাগত সাফল্য দিয়ে প্রকৃত অগ্রগতি পরিমাপ করা আর সম্ভব নয়। অর্জিত সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তী ধাপের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে গভীর সংস্কার এখন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে—এটি এখন সময়ের দাবি।

খিন ঘাটতি শুধু একটি খাতভিত্তিক সমস্যা নয়, এটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এই ঘাটতি শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত শিখন ফল অর্জিত না হওয়া ইঙ্গিত করে যে সমস্যাটি শুধু শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের নয়; বরং এটি শিক্ষার গুণগত মান, শিখন পদ্ধতি, মূল্যায়ন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন না করে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এলে দীর্ঘমেয়াদে একটি অদক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি হবে, যা সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে, তার পূর্ণ বাস্তবায়নও বাধাগ্রস্ত হবে।

শিক্ষাখাতের চ্যালেঞ্জগুলো পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি, কারিকুলামের অপ্রাসঙ্গিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা এবং প্রযুক্তির অকার্যকর ব্যবহার—সব মিলিয়ে এমন এক জটিল বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যার সমাধানে খণ্ডিত উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত ও বহুমাত্রিক উদ্যোগ, যা উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। যদি প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থেকে যায়, তবে সামগ্রিক উন্নয়ন টেকসই হবে না এবং বৈষম্য আরও বাড়ার আশংকা রয়েছে। ভবিষ্যৎ দক্ষতা উন্নয়ন এবং শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে শিক্ষার সংযোগ স্থাপন না করতে পারলে শিক্ষার ফলাফল জাতীয় উন্নয়নের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে একটি রূপান্তরমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এই রূপান্তর শুধুমাত্র কারিকুলাম পরিবর্তন বা অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। এটি হতে হবে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এই সংস্কার হবে গুণগত, কাঠামোগত এবং সমন্বিত যেখানে শুধু প্রবেশাধিকার নয়, বরং শিখন মান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষাকে এখন আর শুধুমাত্র পরীক্ষাভিত্তিক বা সনদনির্ভর একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যাবে না। বরং এটি হতে হবে এমন একটি ব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীদেরকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিবেচনা করা আজ অত্যন্ত জরুরি, যাতে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান অর্জনই নয়, বরং তা প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবনী সক্ষমতাও অর্জন করতে পারে।

সরকারের নীতিগত অঙ্গীকার ও চলমান উদ্যোগগুলো একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এখন প্রয়োজন সেই অঙ্গীকারগুলোকে কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃশ্যমান ফলাফলে রূপান্তর করা। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা, যেখানে সরকার, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন অংশীদার এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষাখাত এখন একটি যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষাকে শুধুমাত্র একটি খাত হিসেবে নয়, বরং সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ করতে হবে। তাহলেই কেবলমাত্র শিক্ষাখাতের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। সঠিক নীতি, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা গেলে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করা সম্ভব হবে। বর্তমান সীমাবদ্ধতাগুলো ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থেকেই অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষাকে একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করার এখনই সময়, যেখানে শিক্ষার গুণগত মান, দক্ষতা, অন্তর্ভুক্তি এবং উদ্ভাবনই হবে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, ও সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রধান অতিথি

ববি হাজ্জাজ, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ অতিথি

মাহ্‌দী আমিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মানিত অতিথি

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, এমপি

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বিশেষ বক্তা

রাশেদা কে চৌধুরী

কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, এবং নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, এবং সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

আসিফ ইব্রাহীম

কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, এবং ভাইস চেয়ারপার্সন, নিউ এইজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক

তৌফিকুল ইসলাম খান

অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা), সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ

সাঈদ রাশেদ আল-জায়েদ
জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ
(এডুকেশন গ্লোবাল
প্র্যাক্টিস), বিশ্বব্যাংক

মুনিয়া ইসলাম মজুমদার
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
টিচ ফর বাংলাদেশ

সমীর রঞ্জন নাথ
প্রোগ্রাম হেড
ব্র্যাক আইইডি

নাদিয়া রশিদ
উন্নয়ন ও
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

ড. রুবাইয়া মোরশেদ
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: **জনাব মো: সামছুর রহমান**

সিরিজ সম্পাদনায়: **অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান**

আয়োজনে

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

www.bdplatform4sdgs.net　BDPlatform4SDGs　Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh　bdplatform4sdgs

মার্চ ২০২৬

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net